পরিবেশ ভাবনার নির্মিতি ও কার্ল মার্কস

শ্যামল চক্রবর্তী

একটি চা বাগানের কোম্পানি আজ থেকে প্রায় চারদশক আগে তাদের 'সুস্বাদু' চা পানের বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। এখনকার মতো 'দুঃখহীন' দম্পতির আত্মস্বার্থসর্বস্ব বিজ্ঞাপন ছিল না। কোথাও যেন একটা দায়বদ্ধতার মিশেল ছিল। আয়তনে একটু দীর্ঘ হলেও পাঠক বন্ধুদের জানাতে বিজ্ঞাপনটির সিংহভাগ এখানে পরিবেশন করব।

মরনাই : মরনাই আসামের গোয়ালপাড়া জেলার একটি সুন্দর চা বাগান। 'মরা নই বা মৃত নদী। সঙ্কোশ নদীর একটি খাদ থেকে এই নাম হয়েছে।

শতবর্ষ আগে : হান্টার সাহেব লিখেছেন, এ জেলায় ছিল অগুন্তি জন্তু-জানোয়ার, নদীতে ঘড়িয়াল বা কুমীর, প্রচুর পাখি, গন্ডার, বনুয়া মোষ, হরিণ, হাতি, সাপ ইত্যাদি।

পঞ্চাশ বছর পূর্বে : এই বাগানের ভূতপূর্ব ম্যানেজার রেভারেন্ড অলুফ আইয়ে লিখেছেন, বাংলোর পাশে বাঘের ডাক শোনা যেত। হাতির পাল বাগানের কাঁটা তার তছনছ করে দিত। জ্যান্ত সাপ ধরে চালান যেত বোম্বের হফকিং ইন্সটিটিউটে। সে খাঁচা দেখে টিপকাই রেল স্টেশনের মাস্টারমশাই কেঁপে উঠতেন। বার বার তালা ঠিক আছে কিনা পরখ করতেন।

আর আজ : বন কমে যাচ্ছে। বন্য প্রাণীরাও। মানুষের জীবনে জঙ্গলের প্রয়োজন আজ সবার জানা। বন আর বন্য প্রাণীদের বাঁচানো আমাদের সবার একটা পবিত্র দায়িত্ব। হাজার গাছ দূষিত কার্বন অক্সাইড বায়ুমণ্ডল থেকে ৩.৭ টন টেনে নিয়ে দেয় প্রাণদায়ী অক্সিজেন ২.৫ টন। তাই আমাদের আবেদন, যেখানে সম্ভব গাছ লাগান।

কম্পিউটার আর মাল্টিমিডিয়ার কাজে পুরোপুরি দক্ষ হলেও এমন বিজ্ঞাপন রচনা করা যায় না। বিজ্ঞাপনের অবয়বে সৌকর্য সৃষ্টি করা যায় যদিও, এমন কথামালা সাজানো যায় না।

বিজ্ঞাপনের জগতে এমন মনীষার অধঃপতন ঘটেছে কিনা, সেই সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা করুন পণ্ডিত মানুষেরা। আমাদের কথা হলো, পরিবেশের সংকট ও সুরক্ষা নিয়ে পৃথিবীতে মাথা ঘামিয়েছেন অনেক বিশিষ্ট মানুষ। সেই তালিকায় কার্ল মার্কস-এর মতো মনীষীও রয়েছেন। কী ভেবেছিলেন কার্ল মার্কস, আজ তেমন ভাবনার সাযুজ্য বা বৈপরীত্য কোথায়, এই নিবন্ধে আমরা তা আলোচনার চেষ্টা করব।

এককথায় বলা চলে, মার্কস বহু বিষয়ে শুধু যে চর্চা করেছেন তাই নয়, বহু মৌলিক চিন্তা আমাদের উপহার দিয়েছেন। সেসব চিন্তন সমগ্রের হীরকদ্যুতি আজও আমাদের দীপ্যমান করে। তাঁর বড় কাজ নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট সংগঠনকে একট তত্ত্ব উপহার দেওয়া। 'রাষ্ট্র' একসময় যেখানে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক দর্শন চিন্তায় জড়িত ছিল, তাকে অর্থনৈতিক দর্শনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন কার্ল মার্কস। তাঁর বহু রচনা আজও অপ্রকাশিত। অনালোচিত। মার্কস-এর গাণিতিক পাণ্ডুলিপি যখন আবিষ্কৃত হলো, বিশ্বের গণিতজ্ঞ মহল বিস্ময় প্রকাশ করেছে। তত্ত্ব ও দর্শন প্রকাশের ক্ষেত্রেই শুধু নন, সেই প্রকাশের লিখনভঙ্গি ছিল অসামান্য। কোথাও তীব্র শ্লেষাত্মক। কোথাও গভীরভাবে বিশ্লেষণাত্মক। সেই মানুষটি যে পৃথিবীর পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়েও ভেবেছিলেন তা অনেককাল মার্কস চর্চাকারদের অগোচরে থেকে গেছে। একটা পর্বে এসে চর্চাকারেরা মনে করলেন, ভেবেছেন মার্কস একটু আধটু, তবে ভাবনার তালিকায় অগ্রগণ্য জায়গা পায়নি। চিন্তন তালিকায় পরিবেশ ভাবনা মার্কসের পশ্চাৎসারির ভাবনা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে মনে পড়ে মার্কস-এর পরিবেশ ভাবনার শীর্ষস্থানীয় নিবন্ধকার জন বেলামি ফস্টারের কথা। ফস্টার নিজেও এক সময় এমটাই ভাবতেন। ফস্টার মার্কিন দেশে সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক উইকিপিডিয়া তাঁর যে পরিচয় দিয়েছে সেখানে লেখা রয়েছে, তিনি ধনতন্ত্রের রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে লেখালেখি করেন। অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে লেখেন। এছাড়া 'বাস্তুসংস্থান, বাস্তুসংস্থানের সংকট ও মার্কসীয় তত্ত্ব' নিয়েও নিয়মিত লেখেন। ফলে মার্কসের পরিবেশ চিন্তা বিষয়ে ফস্টারের ভাবনাকে আমরা অবশ্যই মান্যতা দিতে পারি। এই বিষয়ে একগুচ্ছ বই লিখেছেন তিনি। সেগুলিও তাঁর বিশেষজ্ঞতার প্রমাণ রাখে। বইগুলির নাম আমরা এখানে দিতে পারি। 'দি ভাল্‌নারেল প্ল্যান্ট : এ শর্ট ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট' (১৯৯৪), 'মার্কস'স ইকোলজি' (১৯৯৯), 'ইকোলজি এ্যাগেইনস্ট ক্যাপিটালিজম' (২০০২), 'দি ইকোলজিক্যাল রিভলিউশন : মেকিং পিস উইথ দ্য প্ল্যান্টে' (২০০৯), 'দি ইকোলজিক্যাল রিফ্‌ট : ক্যাপিটালিজম'স ওয়ার অন দি আর্থ' (২০১০), 'মার্কস অ্যান্ড আর্থ : অ্যান অ্যান্টি-ক্রিটিক' (২০১৬)। আগামী দিনে নিশ্চয়ই তিনি আরও লিখবেন। উপরের সব কয়টি বইয়ে পরিবেশ, মার্কসীয় চিন্তা ও ধনতন্ত্রের সম্পর্ক জায়গা পেয়েছে। ২০০৪ সালে পল সুইজির মৃত্যুর পর ও ২০০৬ সালে হ্যারি ম্যাগডফের মৃত্যুর পর জন বেলামি ফস্টার বিখ্যাত 'মান্থলি রিভিউ' পত্রিকার একক সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

আমাদের নিবন্ধে আমরা উপরের বইগুলির নানা ভাবনা নিশ্চয়ই কাজে লাগাবো। এছাড়া মার্কস-এর লেখালেখির অংশবিশেষ তো থাকবেই।

কী বলেছিলেন ফস্টার? ১৯৯৪ সালে যখন পরিবেশ নিয়ে তাঁর প্রথম বই বেরোচ্ছে –, তিনি জানতেন না, মার্কস পরিবেশ নিয়ে এতো গভীরভাবে ভেবেছেন। ধীরে ধীরে তাঁর ভুল ধারণা ভেঙেছে। নিজের দুর্বলতার কথা বলতে তিনি দ্বিধান্বিত নন। তাই আমাদের বললেন, 'হেগেলের দর্শন ও ফয়েরবাখের দর্শন পড়েছি। মার্কস এ বিষয়ে কী বলেছেন দেখেছি। দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে বস্তুবাদের যে বৃহত্তর ইতিহাস লুকিয়ে আছে, সে বিষয়ে পুরোপুরি অজ্ঞ ছিলাম।' একসময় ফস্টারের সহপাঠী ছিলেন ইয়ান শ্যাপিরো। আশ্চর্য একাধিক বিশেষণে ফস্টার তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। নিউইয়র্ক থেকে নির্বাসিত। কৃষক। সূত্রধর। শ্রমজীবী শ্রেণির দার্শনিক। শ্যাপিরো একদিন ফস্টারকে বলেছিলেন, চাষের জমিতে কৃত্রিম সার প্রয়োগ ও কৃষি সংকট বিষয়ে মার্কস বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কোনও দায়সারা গোছের আলোচনা নয়া গভীর আলোচনা। বিজ্ঞানী ফন লিবিখের লেখাপত্র মার্কস খুব যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে পড়েছেন। তারপর নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। খাদ্যসম্ভার উৎপাদন করে কৃষিজমি। সেই জমির উৎপাদন-সক্ষমতার কেমন বদল হচ্ছে।

কার হাতে বদল হচ্ছে, তার স্বার্থ কেমন, এসব কখনও মার্কস-এর চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।

মার্কস আমাদের দেখিয়েছেন, উৎপাদন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। নানা বস্তুকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার অধীনে এনে সামাজিক চাহিদা অনুসারে নানা উপকরণ তৈরি করা হয়। ঐতিহাসিকভাবেই সেক্ষেত্রে উৎপাদকের সঙ্গে প্রাকৃতিক শর্তাদির একটা সমীকরণ তৈরি হয়। স্বভাবতই মার্কস যখন প্রকৃতির কথা বলেছেন সেখানে বস্তুতান্ত্রিক ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও রাজনৈতিক অর্থনীতি মার্কস-এর চোখে প্রধান বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এঙ্গেলস-এর বিজ্ঞান চিন্তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন 'অ্যান্টি-ডুরিং' (১৮৭৮) ও 'ডায়ালেকটিক্স অফ নেচার' (১৯২৫)। 'অ্যান্টি-ডুরিং' এর প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে এঙ্গেলস মার্কসকে চিঠি লিখে বলেছিলেন, 'আমাদের দার্শনিক, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক সমস্যাবলিকে বিশদভাবে বুঝতে চেয়েছি এই বইয়ে।' ১৮৮৩ সালে মার্কস-এর মৃত্যুর পর এঙ্গেলস তার অনেক লেখা (বিশেষত 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের দুই খণ্ড) সুসম্পাদিত আকারে প্রকাশ করেছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে 'ডায়ালেকটিক্স অফ নেচার' এর মতো একটি অবিস্মরণীয় ধ্রুপদীগ্রন্থ বের হতে বহুবছর সময় লেগেছে। এঙ্গেলস তার তিন দশক আগে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি যে প্রাতিষ্ঠানিক অনীহা ও ঔদাসীন্য, তারই পরিচয় এই উদাহরণ। আজও এই গ্রন্থের উপর আক্রমণ থেমে নেই। কথায় কথায় এতদূর এসে গেলাম, আবার আমরা মার্কস-এর কাছে ফিরে যাই। এঙ্গেলস-এর বই দুটি নিশ্চয়ই বিজ্ঞান ও দর্শন চিন্তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। একাধিক পরিচ্ছেদে তার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আমরা অনেক সময় ভুলে যাই, ছাত্রজীবনে যে গবেষণা সন্দর্ভ জমা দিয়ে মার্কস জেনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানেরই এক গবেষণা সন্দর্ভ। আইনবিদ্যার ছাত্র গবেষণাপত্র জমা দিচ্ছেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের, এমনকি খুব একটা দেখা যায়? ১৮৪১ সালের রচনা। মার্কসের বয়স তখন তেইশ বছর। তাঁর থিসিসের শিরোনাম ছিল 'দি ডিফারেন্স বিটুইন দি ডেমোক্রিটিয়ান অ্যান্ড এপিকিউরিয়ান ফিলোজফি অফ নেচার।' বইয়ের আকারে ১৯০২ সালে এই গবেষণা সন্দর্ভ প্রকাশিত হয়েছে। ডেমোক্রিটাসের জন্মসাল আনুমানিক ৪৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। আনুমানিক ৩৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। এপিকিউরাসের জন্মসাল ৩৪১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। ২৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। এই হিসাব থেকে আমরা বলতে পারি, এপিকিউরাস ডেমোক্রিটাসের চেয়ে ১২০ বছরের ছোট ছিলেন। দুজনের অনেক ভাবনায় মিল ছিল। অমিলও ছিল। তাই দেখিয়েছেন মার্কস। একটা কথা মানতেই হবে। এই দুই গ্রিক দার্শনিকই পরমাণুবাদের সমর্থক ছিলেন। 'পরমাণুবাদ' এমন এক দার্শনিক ভাবনা (বৈজ্ঞানিক ভাবনাও বটে) যা ভাববাদী দার্শনিকদের হাতে বারবার আক্রান্ত হয়েছে। প্লেটো যে একসময় ডেমোক্রিটসের বইপত্র ও পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন তা আমরা জানি। আমাদের দেশে শঙ্করাচার্যের শিষ্যকুলদের হাতে কণাদের লেখালেখির একই দশা হয়েছে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বই পড়লে আমরা তা বিস্তারিত জানতে পারি। মার্কসের লেখা থিসিসের কথা আমরা এনেছি শুধু এই কথা বলতে যে ছাত্রজীবন থেকেই তিনি গভীরভাবে বিজ্ঞানচিন্তায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। মার্কসের লেখা গাণিতিক পাণ্ডুলিপির কথাও তো তখন আমরা জানতে পারিনি। অনেক পরে জেনেছি। এছাড়া এঙ্গেলস-এর কাছে মার্কসের লেখা চিঠিপত্রের তালিকা দেখে আমরা বুঝতে পারছি, মার্কস প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গণিত বিদ্যা নিয়ে সত্যিই একনিষ্ঠভাবে চিন্তা করতেন। এঙ্গেলস-এর লেখা চিঠিগুলিও সেকথা প্রমাণ করে। মার্কসিস্ট ইন্টারনেট আর্কাইভ-এ 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গণিতবিদ্যা' শিরোনামে এঙ্গেলস-এর কাছে লেখা মার্কস-এর চিঠি ও মার্কস-এর কাছে লেখা এঙ্গেলস-এর চিঠির একটি তালিকা রয়েছে। সেই তালিকাটি আমরা এখানে যোগ করছি।

লেখক মার্কস/প্রাপক এঙ্গেলস

১১ই জানুয়ারি ১৮৫৮, ২৮শে জানুয়ারি ১৮৬৩, ৬ই জুলাই ১৮৬৩, ২৫শে জানুয়ারি ১৮৬৫, ২০শে মে ১৮৬৫, ১৯শে আগস্ট ১৮৬৫, ৭ই আগস্ট ১৮৬৬, ৩রা অক্টোবর ১৮৬৬, ২২শে জুন ১৮৬৭, ১১ই জানুয়ারি ১৮৬৮, ২৫শে মার্চ ১৮৬৮, ১৮ই নভেম্বর ১৮৬৮, ২২শে নভেম্বর ১৮৮২।

লেখক এঙ্গেলস/প্রাপক মার্কস

১৪ই জুলাই ১৮৫৮, ১১ই ডিসেম্বর ১৮৫৯। ৮ই এপ্রিল ১৮৬৩, ২রা অক্টোবর ১৮৬৬, ৫ই অক্টোবর ১৮৬৬, ১৬ই জুন ১৮৬৭, ২১শে মার্চ ১৮৬৯, ৩০শে মে ১৮৭৩, ২৮শে মে ১৮৭৬, ১০ই আগস্ট ১৮৮১, ২২শে নভেম্বর ১৮৮২, ১৯শে ডিসেম্বর ১৮৮২, ২২শে ডিসেম্বর ১৮৮২।

পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার মাত্র চার মাস আগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গণিতবিদ্যা বিষয়ে এঙ্গেলস-এর কাছে সর্বশেষ চিঠি লিখেছিলেন মার্কস। তাঁর 'গাণিতিক পাণ্ডুলিপি' বইয়ের সমালেচনা করেছিলেন একজন। মার্কস চিঠিতে এঙ্গেলসকে লিখলেন, 'আমার বৈশ্লেষিক পদ্ধতি নিয়ে একটি কথাও নেই, জ্যামিতিক প্রয়োগ নিয়ে অনেক কথা বলেছেন, যা নিয়ে আমি একটি শব্দও লিখিনি।'

নিবন্ধের মাঝে কয়েকটি অনুচ্ছেদ আমরা যোগ করলাম যা মার্কসের পরিবেশ ভাবনা প্রসঙ্গে নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নানা শাখা বিষয়ে তাঁর যে আগ্রহ ও অধ্যয়ন ছিল তা এখানে পরিবেশিত হয়েছে। এই জ্ঞানার্জন যে যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত পরিবেশ ভাবনা গড়ে উঠবার পক্ষে জরুরি, তা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

সভ্যতার ইতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এক-দুদিনে গড়ে ওঠেনি। জেমস ওয়াটের হাতে বাষ্প ইঞ্জিনের আবিষ্কার সভ্যতার নতুন ধাপ রচনা করেছিল, শিল্প বিপ্লবের গতি ত্বরান্বিত করেছিল। শিল্পকেন্দ্রিক প্রযুক্তি যখন একের পর এক আবিষ্কৃত হতে থাকল, উৎপাদন সম্পর্কের বদল ঘটতে থাকল। প্রকৃতি থেকে সম্পদ আহরণ করার ধরনধারণও বদলে যেতে থাকল। এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে বস্তুবাদের মর্মবস্তু অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছে। সত্যি বলতে কী, যে বিষয় নিয়ে মার্কস ডক্টরেট ডিগ্রির গবেষণা সন্দর্ভ রচনা করেছিলেন, সে বিষয়টি 'প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক' বর্ণনায় মার্কস সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। আমরা এখানে এপিকিউরাসের দর্শন ভাবনার কথা বলতে চাইছি। বার্ট্রান্ড রাসেল মার্কসবাদী দার্শনিক ছিলেন না। কিন্তু তিনি তাঁর বিখ্যাত 'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস' গ্রন্থে এপিকিউরাস সম্পর্কে লিখেছেন, 'এপিকিউরাস বস্তুবাদী ছিলেন, নিয়তিবাদী ছিলেন না।' ফ্রান্সিস বেকন ও ইম্মানুয়েল কান্টের লেখাপত্র পড়তে গিয়ে মার্কস দেখেছিলেন, উভয়েই তাঁদের দর্শন নির্মিতিতে এপিকিউরাসের অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর যখন মার্কস দেখলেন যে ফ্রেডরিক হেগেল সোজাসুজি বলছেন, 'অভিজ্ঞতাসঞ্জাত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা হলেন এপিকিউরাস', মার্কস-এর আগ্রহ এপিকিউরাসের প্রতি প্রবলভাবে বেড়ে গিয়েছিল। প্রকৃতির নিয়ত পরিবর্তনশীলতার কথা বলেছেন এপিকিউরাস। তিনি বলেছেন, শূন্য থেকে যেমন কোন কিছু সৃষ্টি হয় না তেমনি কোনও বস্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায় না। বস্তুর প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে মাত্র। বস্তুবাদের আলোকে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্ক অনুধাবন করতে চাইলে এপিকিউরাসের উপরিউক্ত অভিমত আমাদের গ্রহণ করতেই হয়। মার্কস তা গ্রহণ করেছিলেন। বিজ্ঞানের চিন্তা চেতনা গ্রহণে মার্কস আজকাল আর এঙ্গেলস-এর চেয়ে দূরের মানুষ হিসাবে বিবেচিত হন না। একাধিক 'বৈজ্ঞানিক নোটবই' প্রকাশিত হবার পর এমন উপসংহার রচনা সহজতর হয়েছে। উৎকর্ষ উপলব্ধি ছিল বলেই মার্কস দ্রুততার সঙ্গে লিবিখের কাজের তাৎপর্য ধরতে পেরেছেন। বাস্তুসংস্থান বিদ্যায় ডারউইনের কাজের গুরুত্বও উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ঢেঁকসই

উন্নয়নের ধারণাও তাঁর মনে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। যেকোনো বস্তুবাদীর চোখে বিবর্তনের গতিপথ প্রাকৃতিক ইতিহাসে কখনও রুদ্ধ হয়ে যাবার নয়। এর সম্পর্ক যে দ্বান্দ্বিক তা-ও আমরা বুঝতে পারি। প্রকৃতিতে জীবজগৎ জড়জগতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। একের পরিবর্তনের প্রভাব অন্যের উপর পড়তে বাধ্য। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কৃষিজ ফলন জমির মাটির গড়ন বদলে দেয়। সেই বদলে যাওয়া মাটি পরবর্তীকালে কৃষিজ ফলনের মাত্রা ও গুণমানে প্রভাব সৃষ্টি করে। কেউই বিচ্ছিন্ন ও প্রভাবমুক্ত থাকতে পারে না। বাস্তুসংস্থান বিদ্যার বেলায় এটি একটি গোড়ার কথা। মার্কসীয় দর্শন এই বর্ণনাকে পুরোপুরি সমর্থন করে। তাই আমরা অবাক হই না যখন দেখি, মার্কস এঙ্গেলসকে লিখছেন, 'ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্ব আমাদের প্রাকৃতিক ইতিহাস অনুধাবনের ভিত্তি।' অথবা এমন কথাও বলছেন তিনি, 'ধনতান্ত্রিক কৃষির বিকাশ বুঝতে চাইলে একসঙ্গে সকল রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদদের চেয়ে লিবিখ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।' বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে কার্ল মার্কস অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আজ ভাবতে অবাক লাগে, অর্থনৈতিক দর্শন আলোচনায় পৃথিবীতে যে মানুষটি অন্তহীন শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন, যাঁর ভাবনার উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বহু অর্থনীতি চর্চার প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়, তিনি জীবনের প্রথম দিকে দর্শন ও অর্থনীতির সম্পর্ক রচনায় মনোনিবেশ করেননি। ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের পর মার্কস-এর লেখাপড়ার জগতেই থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আকাশে তখন কালো মেঘ। প্রুশিয়ার শাসকদল 'ইয়ং হেগেলিয়ান'দের কোথাও জায়গা দিতে রাজি নয়। চোখের সামনে দেখেছেন, মুক্তচিন্তাচর্চার জন্য হেগেলপন্থী ব্রুনো বোয়ের (১৮০৯-১৮৮২) পছন্দের জায়গায় শিক্ষকতার পদ অর্জন করতে পারেননি। ১৮৩৯ থেকে ১৮৪১সাল পর্যন্ত বোয়ের ছিলেন মার্কস-এর শিক্ষক ও বন্ধু। এঙ্গেলস-এর সঙ্গেও বন্ধুতা ছিল। পরে ভাবনার ভিন্নতার কারণে অবিশ্যি সম্পর্ক শিথিল হয়ে যায়। একরকম বলা যায়, মার্কস বাধ্য হয়েই সাংবাদিকতার জগতে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর প্রথম নিবন্ধ 'ডিবেট্স অন দ্য ল অন থেফ্টস অফ উড।' কাষ্ঠল সম্পদ সংগ্রহের অপরাধে যারা ধরা পড়ে তাদের বিচার ও আইন বিষয়ক নিবন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনবিদ্যার ছাত্র ছিলেন মার্কস। আইনগত দিক থেকে কাষ্ঠল সম্পদ চুরির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাঁর পক্ষে অবশ্যই সহজতর ছিল। এঙ্গেলস বলেছিলেন, এই লেখা থেকে আমরা বুঝতে পারি, মার্কস-এর ভাবনা রাজনীতির ভাবনা থেকে সরে গিয়ে অর্থনীতির ভাবনায় যাচ্ছে ও তার পরে সমাজতন্ত্রের ভাবনা গড়ে উঠছে। ১৮৫৯ সালে মার্কস-এর লেখা 'কনট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি'র ভূমিকায় লিখেছিলেন মার্কস, উপরের উল্লিখিত নিবন্ধটি লিখতে গিয়েই তিনি মুক্ত বাণিজ্য ও সংরক্ষণের বিতর্কে নিজেকে জড়িয়েছেন এবং নানা অর্থনৈতিক প্রশ্নাবলীকে তাঁর ভাবনার বিষয় হিসাবে গড়ে তুলেছেন। এই নিয়ে কোনও আগ্রহী পাঠকবন্ধু যদি আরও বেশি বিস্তারিত জানতে চান তবে পিটার লিনেবাফের লেখা ১৯৭৬ সালের 'ক্রাইম অ্যান্ড সোশ্যাল জাস্টিস' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কার্ল মার্কস, দ্য থেফ্ট অফ উড, অ্যান্ড ওয়ার্কিং ক্লাস কম্পোজিশন : এ কনট্রিবিউশন টু দ্য কারেন্ট ডিবেট' নিবন্ধটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করব। মার্কস-এর ওই নিবন্ধ ১৮৪২ সালের অক্টোবরে লেখা হয়। 'রাইনল্যান্ড নিউজ'-এর ক্রোড়পত্র হিসাবে পাঁচ কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। সেই দীর্ঘ জার্মান নিবন্ধ ইংরেজিত অনুবাদ করেছিলেন রজনী পাম দত্তের অগ্রজ ক্লিমেন্স দত্ত। মার্কস নিবন্ধের শুরুতে বলেছিলেন, এই প্রথম তিনি গরিব মানুষের বিষয় নিয়ে সত্যিকারের পার্থিব প্রশ্নে জড়িয়ে পড়েছেন। চাষির জমির অধিকার এই নিবন্ধের আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল। জন্মসূত্রে যে ভূমির অধিকার ছিল কৃষকের তা আইন করে কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল। শিল্প চাই। কলকারখানা চাই। সুযোগ বুঝে ব্যক্তি সম্পত্তির মালিকানা বৃদ্ধি চাই। বেশিরভাগ অরণ্য সংগ্রাহক মৃত উদ্ভিদের কাঠ সংগ্রহ করতেন। এদের হাতে কখনও

বড়োরকমের ক্ষতি সাধিত হতো না। আজ যখন আমরা 'অরণ্য অধিকার আইন' নিয়ে কথা বলি, অরণ্যপ্রান্ত নিবাসী মানুষদের অধিকার নিয়ে দাঁড়াতে চাই, তখন সাংবাদিক হিসাবে মার্কস-এর লেখা ওই অসামান্য নিবন্ধের কথা আমাদের মনে পড়ে। এই নিবন্ধেই কি তাঁকে 'অসচেতন' ভাবে হলেও প্রকৃতি ও পরিবেশের কথা, বাস্তুসংস্থানের কথা বলতে হয়নি? অমন শিরোনামে হয়তো তিনি বলেননি। অনেক শিরোনামের জন্মও হয়নি তখনও। বিষয়গতভাবে প্রকৃতি, পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান এসে গিয়েছে। বন্যসম্পদ সংগ্রহ করার যে প্রচলিত পদ্ধতি, যার ফলে পরোক্ষভাবে গরিব মানুষেরা বনের পাহারাদারের ভূমিকাও পালন করেন, আইন ছিল সে বিষয়ে নিরুচ্চার। মার্কস তাঁর নিবন্ধে সেদিকে আলোকপাত করেছেন। মার্কস বলেছিলেন, জঙ্গল থেকে গরিব মানুষের মৃত কাঠ সংগ্রহ করা আর জীবিত কাষ্ঠল সম্পদ লুণ্ঠন করে বিক্রি করার অপরাধ কখনও এক হতে পারে না। গরিব মানুষ কাঠ সংগ্রহ করে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যে। ভয়াবহ শীতে আগুন জ্বালিয়ে রাখে ঘরে। আর রান্নাবান্না করে। অরণ্য লুণ্ঠন করে যারা পুঁজির পাহাড় জমায় তাদের অপরাধ নিকৃষ্টতর। গরিব মানুষ যে জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করছে তার মালিকানা থাকে অন্যের। সেই 'অন্য' যখন আইনের সহায়তা পেয়ে যাবে তখন ওই মৃত কাঠের উপর 'দাম' বসাতে পারে। ব্যক্তিপুঁজি বৃদ্ধির পথ সুগম হবে। অথচ বেশিরভাগ সময় গরিব ঘরের শিশু কিশোরেরা ওইসব জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে। বড়রা অন্নের সংস্থানে ভিন্নমুখ হয়। ওইসব শিশু কিশোরেরা আইন তৈরি হলে 'কাঠচোর' হিসাবে চিহ্নিত হবে। এই আইন বর্বরতার। গরিব মানুষকে বাধ্য শ্রমে নিয়োজিত করবে এই আইন। রাষ্ট্র একজন শান্তিপ্রিয় নাগরিককে 'অপরাধী' সাব্যস্ত করছে। প্রকৃতির কাছ থেকে সবরকম সংগ্রহের অধিকার হারাচ্ছে গরিব মানুষ, রাষ্ট্রের আইনি অঙ্গুলি সংকেতে, মার্কস ছিলেন এর বিরুদ্ধে তীব্রভাবে সোচ্চার।

একুশ শতকের ভারতে, আফ্রিকায় ও লাতিন আমেরিকায় আজ একই কথা বলে চলেছেন কারা? সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ বামপন্থী রাজনৈতিক দলের কর্মীরা। দেশে দেশে পরিবেশ আন্দোলনের কর্মীরা। শহীদও হয়ে যাচ্ছেন অনেকে। পৃথিবীতে বেঁচে থাকারই অধিকার হারাচ্ছেন। যে প্রশ্নে সোচ্চার হয়েছিলেন সাংবাদিক ও সম্পাদক মার্কস তাঁর প্রথম নিবন্ধে, সে প্রশ্নে আজ আলোড়িত হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব। তারপরেও কি আমরা মার্কস জীবনের সূচনা পর্বে পরিবেশ প্রশ্নে অগ্রণী ছিলেন না, এমন সন্দেহ তৈরি করতে পারি?

একসময় হেগেল ভাবনায় মেতে ছিলেন মার্কস। তার কারণও ছিল। পূর্বতন দার্শনিকদের চেয়ে চিন্তায় প্রাগ্রসর ছিলেন হেগেল। হেগেলের চেয়ে উন্নততর চিন্তাসূত্র গড়ে তুললেন ফয়েরবাখ। তখন মার্কস এই দর্শনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রকৃতিবাদের (naturalism) প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন ফয়েরবাখ। হেগেলের সাড়ে তিন দশক পরে ফয়েরবাখের জন্ম। সময়ের সঙ্গে দর্শনের বিবর্তন হয়ে চলেছে। ফয়েরবাখ বলছেন, 'প্রকৃতি' তে যার ভিত্তি নেই, তাকে 'বিজ্ঞান' বলা চলে না। সমস্ত বিজ্ঞান, প্রকৃতি থেকেই আহরিত। ফয়েরবাখ এমন কথাও বলতেন, যেখান 'বস্তু' নেই, সেখানে 'যুক্তি' নেই, চিন্তা করার মতো কোনও উপাদান নেই, যুক্তির বিবর্জন হলে তবেই বস্তুর বিবর্জন ঘটে। আবার যুক্তিকে মান্যতা না দিয়ে বস্তুর মান্যতা অর্জিত হয় না। সবশেষে কী বললেন ফয়েরবাখ? বস্তুবাদীরা যুক্তিবাদী। এমন দার্শনিক প্রস্তাবনা মার্কস-এর কাছে হেগেলের প্রস্তাবনার চেয়ে উৎকর্ষ মনে হয়েছিল। তুলনায় একটু বেশিই 'উৎকর্ষ' (!) মনে হয়েছিল একসময়। নইলে ১৮৪৩ সলে এক তরুণ হেগেলিয়ানকে মার্কস লিখতেন না, 'একটি বিষয়ে ফয়েরবাখের কাজ আমার ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়। প্রকৃতির কথা তিনি বড্ড বেশি বলেন।রাজনীতির কথা কম বলেন।'

এমন সাংবাদিকতার চরিত্র নিয়ে হাজির হয়েছিলেন মার্কস, জার্মান প্রশাসন তাঁকে দেশছাড়া না করে শান্তি পাচ্ছিল না। ১৮৪৩ সালে মার্কস বিয়ে করেন। তাঁর জীবনসঙ্গিনী ছিলেন ধনী

পরিবারের কন্যা। মার্কসের লড়াকু জীবনের সঙ্গে তিনি তাঁর জীবন মিলিয়ে দিয়েছিলেন। সে আখ্যান অনুপ্রেরণার। এই নিবন্ধে আমরা সেই বিবরণে প্রবৃত্ত হব না। ওইসময় মার্কস ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। ডক্টরেট থিসিস করতে গিয়ে গ্রিক দর্শন তাঁর অনেকটাই পড়া হয়ে গিয়েছিল। ১৮৪৪ সালে একদিকে প্রকাশিত হলো ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর লেখা 'দি কন্ডিশন অব ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড।' অন্যদিকে মার্কস লিখলেন 'ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোজফিক্যাল ম্যানস্ক্রিপ্ট।' শ্রম, প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক এই পাণ্ডুলিপিতে মার্কস ব্যক্ত করেছেন। ভাবুন পাঠকবন্ধুরা, ১৮৪৪ সালে জার্মান ভাষায় লেখা মার্কস-এর এই বইটি ১৯৩২ সালে প্রথম ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে সোভিয়েত দেশ থেকে বেরিয়েছিল। নয় দশকের ব্যবধান। যাই হোক, ইতিহাসের অগ্রগতিতে মানুষ, উৎপাদন ও প্রকৃতির মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে সেকথা মার্কস স্পষ্টভাবে বলেছেন। প্রকৃতির কাছ থেকে রসদ সংগ্রহ করে তবেই মানুষকে জীবন কাটাতে হয়। কেউ হয়তো সেই রসদ প্রকৃতির বুক থেকে সরাসরি সংগ্রহ করে। কেউ মুদ্রার বিনিময়ে বাজারজাত রসদ নিজেদের জীবনধারণের কাজে লাগায়। কোনও একটি প্রাকৃতিক বস্তু নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যখন মানুষের ব্যবহার উপযোগী সামগ্রীতে পরিণত হয়, মনে রাখতে হয় আমাদের, এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে শ্রম, মজুরি, উৎপাদন, পুঁজি ও মুনাফার সম্পর্ক। কাজেই যে মানুষ বস্তুনিষ্ঠ রাজনৈতিক দর্শন রচনা করবেন, প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক তাঁর কাছে বিবেচনার অপরিহার্য বিষয়বস্তু হিসাবে গৃহীত হবে।

মার্কস-এর উল্লিখিত বইয়ে 'বিচ্ছিন্ন শ্রম'(estranged labour) শিরোনামে একটি অধ্যায় রয়েছে। সেখানে মার্কস প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক কেমন তা আলোচনা করেছেন।মার্কস বলেছেন, শ্রমিকের শ্রম বিনিয়োগ থেকে যে পণ্য উৎপাদিত হয়, তার সঙ্গে শ্রমিকের রয়েছে বিচ্ছিন্নতার সম্পর্ক। পণ্যের জগৎ তার কাছে এক বিচ্ছিন্ন জগৎ হিসাবে দেখা দেয়। তারপর মার্কস আর একটি কথাও বলেছেন। পণ্য উৎপাদনের জন্য শ্রমিক যে শ্রম দান করে তাকেও সে এক বিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ড হিসাবে বিবেচনা করে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিক একাত্মবোধ করে না। একে আত্ম-বিচ্ছিন্নকরণ (self-estrangement) বলা চলে।

পণ্য থেকে শ্রমিকের দূরত্ব, পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে শ্রমিকের দূরত্ব – এরপর মার্কস তৃতীয় একটি বিষয়বস্তুর দিকে আমাদের নজর আকর্ষণ করেছেন। প্রজাতি হিসাবে মানুষ জৈব প্রকৃতিতে বসবাস করে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবন জৈব প্রকৃতিতেই অতিবাহিত হয়। কিন্তু সেখানে অজৈব প্রকৃতিও থাকে। সর্বজনীন মননের মানুষ (Universal man) সেই জৈব ও অজৈব পৃথিবী দুই-ই মেনে নেয়। উভয় সত্তাকে গ্রহণ করে। গাছপালা, জন্তুজানোয়ার, পাথর, বায়ু, আলো – এরা সকলে মানুষের চেতনা নির্মাণ করে। এরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অংশবিশেষ। কলাবিদ্যারও অংশবিশেষ। মানুষ দৃশ্যত প্রকৃতি উৎপাদিত ফসলের উপর নির্ভর করে। খাবার, উত্তাপ, জামাকাপড়, ঘরবাড়ি প্রকৃতি থেকেই আহরিত। মার্কস-এর আলোচিত বইটি থেকে একটি মাত্র লাইন আমরা ইংরেজিতে তুলে ধরছি।

'Man lives on nature-means that nature is his body, with which he must remain in continous interchange if he is not to die.'

'মানুষ প্রকৃতিতে বাস করে – এর মানে হলো প্রকৃতি তার দেহাধার – যদি সে মরতে না চায় তবে অবশ্যই প্রকৃতির সঙ্গে নিয়মিত তাকে আদান প্রদানে যেতে হয়।' মার্কস প্রকৃতিকে মানুষের অজৈবদেহ inorganic body হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রমের বিচ্ছিন্নতা তত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে মার্কস প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানুষ বিষয়ে তাঁর অভিমত স্পষ্ট করেছেন। এই অভিমত

বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক। ১৯৪৪ সালে কার্ল মার্কস-এর লেখা 'অন দি জ্যুইশ কোশ্চেন' প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়। এক অসাধারণ নিবন্ধ। একজন বস্তুবাদী মানুষ ধর্মকে কেমন চোখে দেখবেন, এই নিবন্ধ তার আদর্শ উদাহরণ। নিবন্ধে নানা কথা বলতে গিয়ে মার্কস লিখলেন, 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পুঁজির আধিপত্যে পরিবেশের ভারসাম্য চরমভাবে বিঘ্নিত হয়।' মার্কস আরও লিখেছিলেন, 'একথা সত্য যে ইহুদি ধর্মে পরিবেশের ধারণা রয়েছে। তবে সেই ধারণা শুধুমাত্র কাল্পনিক।' মার্কস পরিবেশ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে টমাস মুনজেরের (১৪৮৯-১৫২৫) পরিবেশ ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। টমাস মুনজের ছিলেন একজন ধর্মপ্রচারক। চরিত্রে রেডিক্যাল। মার্টিন লুথারের ধর্মভাবনা ও রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মভাবনার সঙ্গে তাঁর ভাবনার বিরোধিতা ছিল। লুথার যখন সামন্তপ্রভুদের সঙ্গে বোঝাপড়া করছেন, মুনজের সোচ্চার প্রতিবাদ জানান। কৃষক সমাজের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হয়েছিলেন তিনি। জার্মান কৃষক যুদ্ধে ১৫২৫ সালে নেতৃত্ব দেন মুনজের। তিনি ধরা পড়ে যান। তাঁর শাস্তি হয় মৃত্যুদণ্ড। কেউ যেন তাঁর মতো 'বেয়াদপি' না করে সেজন্য তার মাথাটি লোকালয়ে বহুকাল টানিয়ে রাখা হয়েছিল। হত্যা করে কে কবে কার আদর্শ মুছে দিতে পেরেছে? জার্মানির কৃষক বিপ্লবের ইতিহাসে টমাস মুনজের অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসন দখল করেছেন। মার্কস মুনজেরের লেখা থেকে উদ্ধৃত করেছেন :

'সমস্ত জীবন সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। জলের মাছ, আকাশের পাখি, পৃথিবীর গাছপালা, সকলের মুক্তি চাই।' ব্যক্তি সম্পত্তির অধিকারীরা যেভাবে পরিবেশ ধ্বংসের কাজ করে চলেছেন তার অবসান চেয়েছিলেন মুনজের। নাগরিক জীবনে পরিবেশের যে দূষণ ঘটে সে বিষয়ে মার্কস ছিলেন সম্পূর্ণ অবহিত। বড় বড় শহরে দূষণের প্রসঙ্গ মার্কস 'ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোজফিক্যাল ম্যানস্ক্রিপ্ট' নিবন্ধে টেনে এনেছেন। মার্কস লিখেছেন : 'শ্রমিকদের যে বিশুদ্ধ বায়ু প্রয়োজন সেকথা কেউ মনে করিয়ে দেয় না। মানুষ যেন আবার আদিম গুহায় থাকবে বলে মুখ ফিরিয়েছে। অথচ সেই গুহায় সভ্যতা পূতিগন্ধময় ও বিরক্তিকর আবহ দেখা যায়। উপরন্তু, শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীনভাবে সেই গুহায় কোনওরকমে বেঁচে থাকতে হয়। কারও দয়ায় শ্রমিক যেন সেই অচেনা জায়গায় বাস করছে। অর্থ মিটিয়ে দিতে না পারলে যেকোনো সময়ে উচ্ছেদ হয়ে যাবে। আলোয় বসবাস তার পক্ষে পুরোপুরি রহিত। আলো, বাতাস ইত্যাদি – যা পরিচ্ছন্নভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন–মানুষের প্রয়োজনের তালিকা থেকে মিলিয়ে গিয়েছে। নোংরা ও আবর্জনাময় পরিবেশে বসবাস করা তার জীবনের ধর্ম।'

বিশুদ্ধ পরিবেশবাদী ছিলেন না মার্কস, রাজনীতির প্রসঙ্গ সেখানে অবধারিতভাবে এসেছে। পরিবেশ প্রসঙ্গ যে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা নয়, রাজনীতি ও অর্থনীতি তার প্রতি পদক্ষেপে জড়িত, মার্কস তাঁর সৃজনশীল জীবনের সূচনা থেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

হেগেল তাঁর 'ফিলোজফি অব নেচার' গ্রন্থে প্রকৃতির কথা বলেছেন। সে ভাবনা ভাববাদী, বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। বর্ণনায় তাঁর সাহিত্যবোধ প্রগাঢ়। ফয়েরবাখ কিন্তু পরিবেশ প্রশ্নেও হেগেলের চেয়ে বেশি বস্তুবাদী ও অগ্রবর্তী। তাই মার্কস তাঁর সমর্থন জানিয়েছেন ফয়েরবাখের পরিবেশ ভাবনায়। সমালোচনা করেছেন হেগেল ভাবনার। দুজনের তুলনা শেষে মার্কস নিজেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন :

'A being which does not have its nature outside itself is not a natural being and plays no part in the system of nature' (Early Writings, Karl Marx)

মার্কস বলতেন, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে বলেই প্রাকৃতিক ইতিহাস মানুষের ইতিহাস বাদ দিয়ে রচিত হতে পারে না। মানব ইতিহাসও প্রাকৃতিক ইতিহাস বাদ দিয়ে রচিত হতে পারে না। দুই ইতিহাস পরস্পর সম্পর্কিত। যারা বলেন জীবনের ভিত্তি একরকম ও বিজ্ঞানের ভিত্তি অন্যরকম তারা মিথ্যে বলেন। বিজ্ঞান মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের অবিরত

বদল ঘটাচ্ছে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে শিল্প ও কলকারখানা। যার ফলে এই বদল ঘটছে। বাজারে মাঝে মাঝে এমন উপকরণ দেখা দেয় যে, মানুষের সম্পর্কের ধারণাটাই বদলে যায়। উদাহরণের বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। একবার ভাবুন – চিঠিপত্র, টেলিফোন, টেলিফোন পেতে এপার-ওপার থেকে দীর্ঘ প্রতীক্ষা, মোবাইল, ই-মেইল, হোয়াট্‌স আপ – সম্পর্কের বদল ঘটাচ্ছে কি ঘটাচ্ছে না? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে এমন বদল যে অপরিহার্য, একথা বুঝতে পেরেছিলেন মার্কস। তাঁর লেখনীতে তিনি প্রকাশ করেছিলেন। যারা বিচ্ছিন্নতার ধারণাকে শুধুমাত্র দার্শনিক স্তরে আবদ্ধ রেখে আলোচনা করতে চান, আর্থসামাজিক প্রসঙ্গকে এর সঙ্গে জুড়তে রাজি নন, তাদের ভাবনা থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরেছেন মার্কস। নিজের ভাবনা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

একথা সকলেই জানেন, ডারউইন তাঁর গবেষণা জীবনের শুরুতে টমাস রবার্ট ম্যালথাসের 'পপুলেশন' নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ে আগ্রহ দেখান। পরে যখন তিনি 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্ব প্রণয়ন করেন, ম্যালথাস ভাবনার প্রতি তাঁর সন্দেহ তৈরি হয়। এদিকে একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ের প্রতি আমরা এখনও দৃষ্টি নিবদ্ধ করিনি। ১৮৪২ সালের শেষদিকে ফ্রান্সের কলোন শহরে মার্কস-এর সঙ্গে প্রথম এঙ্গেলস-এর দেখা হয়। মার্কস সে সময় 'রাইনল্যান্ড নিউজ' সম্পাদনা করছেন। এঙ্গেলস তাঁর বাবার পরামর্শ মতো ম্যানচেস্টারে একট কাপড় তৈরির কারখানায় করণিক পদে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। এই কারখানায় এঙ্গেলস পরিবারের অংশীদারিত্ব ছিল। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দুই স্রষ্টার এই প্রথম সাক্ষাৎকার বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল না। 'ইয়ং হেগেলিয়ান আন্দোলন' নিয়ে দু-চার কথা হয়েছিল। বিশেষত কী কারণে এই আন্দোলনে নানা বিভেদ ও দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছিল তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পরে ১৮৪৪ সালে আবার যখন দুজনের প্যারিস শহরে দেখা হয়, দুজনেই দুই বই নিয়ে হাজির। 'ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোজফিক ম্যানস্ক্রিপ্ট'। 'দি কন্ডিশন অব ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড'। তখন এঁদের আলোচনা গভীরতা অর্জন করে। আজীবন বন্ধুত্বের সূচনা হয়। একমাত্র বোধহয় মার্কস ও এঙ্গেলসই এমন দুজন ব্যক্তিত্ব, যেখানে মার্কস বিষয়ক নিবন্ধে এঙ্গেলস প্রসঙ্গ বা এঙ্গেলস বিষয়ক নিবন্ধে মার্কস প্রসঙ্গ এলে কেউই তা গণ্ডিরেখার অতিক্রমণ মনে করেন না।

ম্যালথাসের 'পপুলেশন' নিবন্ধ মার্কসকে যেমন ভাবিয়েছে, এঙ্গেলসকেও ভাবিয়েছিল। এঙ্গেলস এই নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বিরোধিতার মাত্রা অনুমান করতে পারি যখন আমরা দেখি ম্যালথাসের তত্ত্ব বিষয়ে এঙ্গেলস বলছেন, 'the crudest most barbarous theory that ever existed....'। 'পৃথিবীতে যতরকমের তত্ত্ব বিদ্যমান, ম্যালথাসের তত্ত্ব এদের মধ্যে নিষ্ঠুরতম ও বর্বরতম।' এর চেয়ে কঠোর ভাষা আমাদের জানা নেই। এঙ্গেলস তাঁর বইয়ে ম্যানচেস্টার শহরের দুই বিপরীত পৃথিবীর ছবি আমাদের দেখিয়েছেন। শ্রমিকদের থাকবার যে বস্তি সেখানকার দুঃসহ চেহারা ও কলুষিত পরিবেশের ছবি দেখিয়েছেন। বুর্জোয়াদের ঐশ্বর্যময় বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ছবিও দেখিয়েছেন। শ্রমিকের জনস্বাস্থ্যের চিত্র তুলে ধরেছেন এঙ্গেলস। নানা বিষাক্ত গ্যাসের নির্গমন আলোচনায় এসেছে। বড় বড় শিল্প নগরীতে শ্রমিকদের দূষিত পরিবেশে সপরিবারে দিন কাটাতে হয়। এ দৃশ্য মার্কসও প্রত্যক্ষ করেছেন। নিজের প্রথম দিককার লেখালেখিতে মার্কস তা লিখেছেন। আইরিশ এক শ্রমিকের জীবনযাত্রার বিবরণ দিতে গিয়ে মার্কস লেখেন, 'আলো, হাওয়া ইত্যাদি – এই অতিসাধারণ চাহিদা তার পূরণ হয় না। একটা চাহিদাই বেঁচে আছে – খাবারের চাহিদা। খাবার হিসাবে আলু দেওয়া হয়। তা-ও পচা আলু। সবচেয়ে নিকৃষ্টজাতের আলু।' শ্রমিকদের জীবনে পরিবেশের এই দূষণ পৃথিবীর সর্বত্র, মার্কস তাঁর লেখায় একথা উল্লেখ করেছেন। একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করলে ভালো হয়। মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলি থেকে আমরা জানতে পারি, ফয়েরবাখ বিষয়ে দুজনেরই অভিমত, 'ফয়েরবাখ যখন বস্তুবাদের কথা বলছেন, ইতিহাস তাঁর

আলোচনায় আসছে না। আবার যখন ইতিহাসের কথা বলছেন, বস্তুবাদ আলোচনায় আসছে না। দুটি বিষয় তাঁর কাছে আলাদা।' আলাদা তো বটেই। নইলে মার্কস-এঙ্গেলস 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'এর স্রষ্টা হিসাবে বিবেচিত হতেন না, ফয়েরবাখ সেই কৃতিত্বের অধিকারী হতেন। ফয়েরবাখের কথা শেষ করে মার্কস-এঙ্গেলস তারপর নিজেদের কথা বললেন।

'সকল ইতিহাসের প্রথম শর্ত হচ্ছে মানুষকে ইতিহাস গড়ার জন্য বেঁচে থাকতে হবে। বেঁচে থাকার প্রাথমিক শর্ত আহার ও পানীয়, বাসস্থান, পরিচ্ছদ ও আরও নানা শর্তাবলি। প্রথম ঐতিহাসিক কাজ তাই উপরিউক্ত চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় উৎপাদন ব্যবস্থা আয়ত্ত করা ... যা সকল ইতিহাসের প্রাথমিক শর্ত।' প্রকৃতি বিদ্যা অধ্যয়নের প্রধান দুই শাখা ভূ-বিজ্ঞান ও ভূগোলবিদ্যা। এই দুই বিষয়ের দিকে মার্কস-এঙ্গেলস গভীরভাবে নজর দিয়েছেন। সবটা নজর পরিবেশবিদ্যা চর্চার প্রয়োজনে ছিল না। বুর্জোয়া সম্পত্তির পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে নগর ও গ্রামের বিভাজন বাড়ছে। তা অনুধাবন করতে গিয়ে প্রকৃতির পাঠ নিতে হয়েছে। কলকারখানা বুঝতে গেলে উৎপাদনের নানা শর্ত বুঝতে হয়। ভূ-বিজ্ঞান ও ভূগোল বিদ্যা উৎপাদনের শর্ত নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কস ভূবিজ্ঞান ভালো জানতেন। জিমনাসিয়ামে পড়ার সময় তিনি সুপরিচিত ভূ-বিজ্ঞানী যোহানেস স্টাইনিঙ্গারের কাছে পড়েছেন। এই মাস্টারমশাই গণিত, পদার্থবিদ্যা ও ইতিহাস খুব ভালো জানতেন। ছাত্রদের কাছে তিনি খুব প্রিয় ছিলেন। একটাই 'অভিযোগ' ছিল। খ্রিস্টান ধর্মের খুব সমালোচনা করতেন। এমনটা নয় যে তিনি অন্য ধর্মের প্রশংসা করতেন। ধর্ম জিনিসটা আসলে কী, তাঁর মতো করে বলতেন তিনি। অনেক ছাত্র এর ফলে নীতি ধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়েছিল। ধর্মের কর্তারা মাঝে মাঝে তাঁকে সতর্ক করতেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নৃতত্ত্ববিদ্যা' পড়াতেন হাইনরিখ স্টিফেনস। মানুষের ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বুঝতে মার্কসের এর ফলে সুবিধে হয়েছে। ভূ-বিজ্ঞানে পৃথিবীর যে জন্মবৃত্তান্ত রয়েছে মার্কস তাঁর 'ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোজফিক্যাল ম্যানস্ক্রিপ্ট' এ সে কথাই লিখেছেন। যেমন বলেছেন এপিকিউরাস, কবিতায় এপিকিউরাসের ভাবনাকে যেমন করে রূপদান করেছেন লুক্রেসিয়াস, ঠিক তেমন ভাবনারই অনুসারী ছিলেন মার্কস। কী সেই ভাবনা? সঠিক বলতে গেলে পৃথিবীকে 'মা' বলতে হবে। কেন না, এই পৃথিবী থেকেই সকল জীবনের জন্ম হয়েছে। নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যে জীবনের বিকাশ জড়িয়ে আছে, একথা স্পষ্টভাবে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস তাঁর বিখ্যাত 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' গ্রন্থে বলেছেন। তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আমরা যাব না।

বাকিদের চেয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর প্রতিবেদনের অনন্যতা কোথায়? অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এই দুজন প্রকৃতির বস্তুবাদী ধারণার সঙ্গে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার সম্পর্ক বিবৃত করেছেন। মানুষকে আমাদের জানতে হবে দুরকমের ভূমিকায়। মানুষ একদিকে যেমন প্রাকৃতিক জীব অন্যদিকে সামাজিক জীবও বটে। আমাদের জানতে হবে শ্রমের ভূমিকা যা উৎপাদন সম্পর্কের বদল ঘটায় ও মানুষের ইতিহাস রচনা করে। মানুষকে যে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে হয় সেকথাও মনে রাখতে হবে। মানুষের সামাজিক চরিত্র ও শ্রমের ভূমিকাকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখা হতো এমন প্রতিক্রিয়াশীল আবেগপূর্ণ ভাবনাও তখন সমাজে প্রচলিত ছিল। এই ভাবনা পুরানো সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। বস্তুর পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করে। মার্কস-এঙ্গেলস এই ভাবনার অবসান চেয়েছেন।

ফরাসি অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক পিয়ের জোসেফ প্রুঁধো (১৮০৯-১৮৬৫) যে সমাজ ব্যবস্থার কল্পনা করেছিলেন, শ্রম উৎপাদন ও ব্যক্তিসম্পত্তির যে সম্পর্ক গড়েছিলেন, গ্রিক পুরাণের চরিত্র প্রমিথিউসকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যে সামাজিক অর্থনীতির ধারণা প্রণয়ন করতে চেয়েছিলেন, মার্কস তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। মার্কস-এর লেখা 'দ্য পোভার্টি অব ফিলোজফি' গ্রন্থে সেই

বিরোধিতার পরিচয় মেলে। প্রুঁধোর মতে প্রকৃতিকে জয় করেছেন প্রমিথিউস। মার্কস অভিযোগ করেছেন যে প্রুঁধো সামাজিকতার সম্পর্কে ঐতিহাসিকতার উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে ত্রুটিপূর্ণ উপসংহার রচনা করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে নিবন্ধের কেন্দ্রীয় অভিমুখ থেকে বিচ্যুত হতে হয়। সে পথে পা বাড়াবো না। মার্কস-এর বড় অভিযোগ ছিল, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টনের সম্পর্ক রচনা করতে গিয়ে প্রুঁধো 'ম্যাজিক' এর আশ্রয় নিয়েছেন, বিজ্ঞানসম্মত অর্থনৈতিক সূত্রের আশ্রয় নেননি। তবু আমরা অবাক হই দেখে, পরবর্তীকালে, ঠান্ডাযুদ্ধের প্রথম যুগ থেকে, মার্কসকেই প্রমিথিয়বাদের অনুসারী বলে চিহ্নিত করার অভিসন্ধি শুরু হয়। কারা কারা একাজ করেছেন, কী তাঁদের নাম, কী তাঁদের নিবন্ধের শিরোনাম তা আমরা লিখছি না। জন বেলামি ফস্টারের বইপত্রে আমরা সেসব তথ্য পেয়ে যাই। এই চিন্তাবিদেরা মার্কস-এঙ্গেলস-এর 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'কেও 'প্রমিথিয়বাদ' ভাবনায় সংক্রমিত বলতে দ্বিধা করেননি। এই অভিযোগ অর্থহীন। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোকে প্রকৃতির বস্তুবাদী ধারণার সঙ্গে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার আন্তঃসম্পর্কের যে পরিচয় রয়েছে তা উপরের অভিযোগকে বিন্দুমাত্র সমর্থন করে না। অত্যধিক বর্ণনা ও তথ্যসূত্রে যদি আমরা নিজেদের ভারাক্রান্ত না করতে চাই তবে একটি সংকলিত নিবন্ধ গ্রন্থে ('দি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো নাউ') ফস্টারের লেখা কুড়ি পৃষ্ঠার 'দি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট' নিবন্ধটি পড়ে দেখতে পারি। প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক বিষয়ে জীবনের প্রথম পর্বে যে চিন্তাসূত্র উত্থাপন করেছিলেন মার্কস, 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে করে সামান্যতম বদল ঘটেনি। কৃষি ও শিল্পের সম্পর্ক বিষয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস যে ধারণা পোষণ করতেন সে বিষয়ে সম্যক উপলব্ধির অভাব থেকে এদের 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' আক্রান্ত হয়েছে। 'প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের বশে আনা' কথাটি নিয়েই যত বিতর্ক। মনে রাখা দরকার, মার্কস ও এঙ্গেলস কখনও যান্ত্রিকভাবে প্রমিথিয়বাদ কাজে লাগাননি। যন্ত্র ও শিল্পায়নকে তাঁরা স্বাগত জানিয়েছেন ঠিকই। কখনও কৃষির বিনিময়ে নয়। তবে উন্নয়নহীন পশ্চাৎপদতা বাঁচিয়ে রাখা কখনও এঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা যখন মার্কস-এর কাছ থেকে 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থ পেলাম তারপর আর সমালোচনার অবকাশ রইলো না। প্রকৃতি বিষয়ে তাঁর বস্তুবাদী ধারণা তিনি সামগ্রিক আকারে পেশ করেছেন। যখন মার্কস 'শ্রম'—এর ধারণা সংজ্ঞায়িত করেন সেখানে তিনি মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার সম্পর্ককে চরিত্রায়িত করেছেন এই বলে যে '...a process by which man, through his own actions, mediates, regulates and controls the metabolism between himself and nature.' ধনতান্ত্রিক উৎপাদন এর ফলে যে অপ্রতিমুখী ধ্বংস সাধিত হয় তা মার্কস স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করার ভাবনা বুর্জোয়া সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। উৎপাদন সম্পর্কের এই ভিত্তি মেনে মার্কস 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে বুর্জোয়া রাজনৈতিক অর্থনীতির তিনটি প্রধান নীতির সমালোচনা করেন। সে আলোচনা বহুধা বিস্তৃত। সবশেষে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'বস্তুবাদ জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের একটি রচনা থেকে কয়েকটি লাইন যোগ করে এই নিবন্ধ শেষ করব।

'মার্কস-এর আগে কান্ট, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকও এক-একটি প্রস্থান রচনা (সিস্টেম-বিল্‌ডিং)-য় মন দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ছিল তাঁদের নিজস্ব দার্শনিক অনুসন্ধানের বিস্তার। প্রকৃতি ও মানুষের জীবনকে একসূত্রে গাঁথার কোনও ইচ্ছে বা চেষ্টা তাঁদের ছিল না। বরং প্রকৃতি ও মানুষের জগৎকে তাঁরা দুটি আলাদা ক্ষেত্র বলেই ধরতেন। মার্কস-এঙ্গেলস-এর হাতেই প্রকৃতি ও মানুষের জগৎ একই নিয়মের অধীন বলে দেখানো হলো। এর পরিণামে শুধু অতীত আর বর্তমানকে বোঝাই দর্শনচর্চার একমাত্র লক্ষ্য থাকল না। পরিবর্তনকে অনিবার্য বলে মেনে নেওয়ার ফলে দুনিয়াকে পালটানোই তার কাজ হয়ে ওঠে। ফয়েরবাখ বিষয়ে শেষ থিসিস-এ মার্কস এই কথাই বললেন। আর এইভাবেই এক নতুন বিশ্ববীক্ষার পত্তন হলো। সেটি শুধু ব্যাখ্যা করে না, বদলাতেও চায়।'